তবুও বই পড়ুন

ড. আবদুল লতিফ মাসুম
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
mal55ju@yahoo.com

মুক্তিযুদ্ধের ‘চরমপত্র’ খ্যাত এম আর আখতার মুকুল বেইলি রোডে একটি বইয়ের দোকান দিয়েছিলেন। দোকানটির নাম ছিল সাগর পাবলিশার্স। দোকানটির একটি স্লোগান ছিল ‘তবুও বই পড়–ন’। দোকানটির নামের চেয়ে স্লোগানটি বড় করে লেখা ছিল। অনেকেই ভাবত দোকানটির নামই হয়তো ‘তবুও বই পড়ুন’। আসলে বই পড়ার ক্ষেত্রে সে সময়ে যে সমস্যা, সঙ্কীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা ছিল, তা অতিক্রম করে বই পড়ার আহ্বান ছিল ওই স্লোগানটির আসল অর্থ। সেটি ছিল আশির দশক। এরই মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় অনেক পানি গড়িয়েছে। রাজা-রাজ্য-রাজধানীর অনেক ওলটপালট হয়েছে। কিন্তু বই পড়া বা বই কেনার সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। বরং বলা যায় সমস্যাগুলো আরো জটিল-কঠিন-কুটিল হয়েছে। বিশ্বব্যাপী তথ্যবিপ্লব, সর্বাধুনিক কলকব্জার ব্যবহার, সর্বোপরি বিশ্বায়নের প্রভাব- ‘বই পড়া ও বই কেনা’কে বাড়িয়ে দেয়নি; বরং কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের মতো আটপৌরে লোকেরাই কেবল ‘হার্ডওয়্যার’ নির্ভরশীল রয়েছি। তথ্যবিপ্লবীরা ‘সফটওয়্যারে’ বিশ্বাস করেন। বই তাদের গতানুগতিকভাবে কিনতে হয় না। বই তাদের স্পর্শ করতে হয় না। তারা জ্ঞানবিজ্ঞানের তাবত গ্রন্থাবলি ‘নেট’-এ পড়ে নেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার ‘ভবিষ্যৎ এর মানুষ’ গল্পে এ রকম কিছুরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ভবিষ্যতের মানুষের হাত আর এত লম্বা থাকবে না। আঙুলের মতো হবে হাত। শুধু বাটন টেপার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হবে। মজার ব্যাপার বিংশ শতাব্দীর এ প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে ড. শহীদুল্লাহর মতো মন্তব্য করেছেন স্যার স্টিফেন হকিং। তিনি অতি সম্প্রতি এক নিবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে ‘জীবিকা অর্জনের সক্ষমতা’ নষ্ট হওয়ার জন্য প্রযুক্তি বিপ্লবকে দায়ী করেছেন। এ প্রযুক্তি সেখানে ‘ট্রাম্পকে বিজয়ী’ ও ব্রেক্সিট বিচ্ছিন্নতা দেয়ার

অন্যতম কারণ। আমরা বলছিলাম, বই পড়া বই কেনার কথা। প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে আমাদের বই প্রকাশনা শিল্প অতটা ব্যাহত না হলেও ধাক্কা লেগেছে অনেকটা। ছাত্ররা বই কিনতে চায় না। নেটে বই খোঁজে। নির্দিষ্ট বইয়ের নাম দিলে একটা বই কিনে শতকপি ফটোকপি করে। তবে অতি আধুনিকায়নের ধাক্কা আত্মস্থ করে আমাদের প্রকাশনা শিল্প আমাদের বইমেলা বই বিপণন টেকসই উন্নয়ন অর্জন করেছে। বই না পড়া জাতি হিসেবে আমাদের বদনাম আছে। বাংলা সাহিত্যে 'বই পড়া' আর 'বই কেনা' নিয়ে দুটো বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। শিক্ষিত লোকদের এ প্রবন্ধ দুটোর সাথে অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। প্রথম ভারিক্কি প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর। দ্বিতীয়টি রূপ-রস-গন্ধে ভরা রম্য লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর। প্রমথ চৌধুরী বই না পড়ার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তারপর তিনি আমাদের 'মনোজগৎকে' দুষিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন অর্থকরী নয় এমন সব কিছুই এ দেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। বই পড়ার প্রতি লোকজনের অনীহা অনেক। প্রমথ চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে বলেছেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়'। এখন ব্রিটিশ তাড়ানোর ৬৯ বছর পরও কি আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে? 'ডিজিটাল ডিগবাজি' আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এনে দিয়েছে। কারণ হলো 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া'। যা হোক, সে বিতর্ক অন্য রকম। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু... আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের উপরে পড়ে রয়েছে।' কত দিন আগে এই মহান সাহিত্যিক এসব কথা বলেছেন। অথচ মনে হয় যেন এটি আজকের কথা। আমাদের দুর্দশার বাস্তব চিত্র। একবিংশ শতাব্দীর এই পাদপিঠে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে, অর্থনৈতিক দস্যুতা এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে। টানেলের শেষ প্রান্তে কোনো আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। অজ্ঞানতার অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরেছে। জীবনানন্দের ভাষায়- অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,

যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;

যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই-

করুণার আলোড়ন নেই

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি

এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়

মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা

শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

অন্য দিকে যারা আলোকিত সমাজের কথা বলছেন, যারা জ্ঞানের শক্তির কথা বলছেন, যারা সত্য-সুন্দরের কথা বলছেন তারা আজ বড় অসহায়। আমাদের রাজনীতিবিদেরা 'জ্ঞানভিত্তিক সমাজ'-এর কথা বলছেন, সাহিত্যচর্চাকে ভুল পথ থেকে বিরত থাকার বাহন বলছেন অথচ শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেছেন। শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া 'কালি ও কলম' থেকে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় কথায় নয়, আমাদের কাজকর্মে বাস্তবে দেখাতে হবে 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পুণ্য'। জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায়, আমাদের 'চক্ষে জ্বলুক জ্ঞানের মশাল বক্ষে দেশপ্রেম'। সৈয়দ মুজতবা আলী তার 'বই কেনা' নিবন্ধে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি জীবনদৃষ্টি বাড়াবার দুটো পথের কথা বলেন : প্রথমত, 'বই কেনা বই পড়া'। দ্বিতীয়ত, 'আপন ভুবনে রাজা হওয়া'। সৈয়দ সাহেব বারট্রান্ড রাসেলকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভেতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেয়া এবং বিপদকালে তার ভেতর ডুব দেয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।' সৈয়দ মুজতবা আলী কুরআন কিতাবের দোহাই দিয়েছেন। "মুসলমানদের পয়লা কিতাব কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহাম্মদ সা: শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে, 'আল্লামা বিল কলাম' অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের

মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।" সৈয়দ সাহেব যথার্থই সত্য বলেছেন। আমরা সবাই জানি আল্লাহর তরফ থেকে মুহাম্মদ সা:-এর প্রতি প্রথম বাণী- 'ইক্রা' অর্থাৎ পড়ো। সূরা আলাকে বর্ণিত প্রথম পাঁচটি বাক্য এ রকম- 'পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। সেই প্রভুর নামেই পড়ো যিনি সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা তারা জানত না।' কুরআন-হাদিসের অসংখ্য বাণীতে জ্ঞান সাধনার কথা বলা হয়েছে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে, 'সামান্য সময় জ্ঞানার্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।' এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত আরেকটি উক্তি- 'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান।' সব ধর্মে, সব দর্শনে জ্ঞানার্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, 'নহি জানেন যদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে'- পৃথিবীতে জ্ঞানের চেয়ে আর পবিত্র কিছুই নেই। বৌদ্ধ ধর্মে ৩৮টি মঙ্গল সূত্রের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যা অর্জন করা, বিনয়ী সুশিক্ষিত হওয়া, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা অন্যতম। আরেকটি শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যথাপির রহদো গম্ভীর বিপ্রসন্য অনাবিল এবং ধম্মানি সূত্রয়ানা বিপসি দন্তি পণ্ডিতা।' এর সরল অর্থ এ রকম- 'গভীর হ্রদ-সরোবর যেমন স্বচ্ছ ও প্রশান্ত থাকে সেরূপ বিদ্যান, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ নীতি আদর্শে অনড় থাকেন।' খ্রিষ্টধর্ম গ্রন্থ বাইবেলের অপর নাম 'সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'। দেখা যাচ্ছে, সব ধর্মেই জ্ঞান সাধনার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাবত মনীষী জ্ঞানের জয়গান গেয়েছেন। লিও টলস্টয় বলেন, মানুষের জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- বই, বই এবং বই। এই জ্ঞান তো এমনি এমনি আসবে না। এ জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বই পড়তে হবে। বই পড়তে হলে বই কিনতে হবে। বই পড়ার আরেকটি উপায় হলো লাইব্রেরি থেকে বই নেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুটো বিষয়েই আমাদের ঘাটতি রয়েছে। 'বই পড়া' ও 'বই কেনা'র উভয় লেখক বই কিনতে আমাদের মনের গরিবি হালতের কথা বলেছেন- 'যারা হাজার খানা ল-রিপোর্ট কেনেন তারা একখানা কাব্যগ্রন্থ কিনতে রাজি নন, কেননা তাদের ব্যবসায় এর কোনো দরকার নেই।' সৈয়দ সাহেব খেদোক্তি করে বলেন, 'বই কিনতে পয়সা লাগে- ব্যস। এর বেশি আর কিছু

নয়... ধনীরা বলে পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর?' আসলে যেকোনো বিষয়ে যে যার মতো করে চিন্তা করে। পুরান ঢাকায় একটি প্রচলিত গল্প এ রকম- একজন ঢাকাইয়া আদিবাসী (কুট্টি বলাটা এরা পছন্দ করেন না) একবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে প্রধান অতিথি হয়েছেন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলছেন, 'আমি হালায় দ্যাখতাছি যে, রবীন্দ্রনাথ বহুত ভালা ব্যবছায়ী আছিল, একছো বছর আগে লিখছে, হালায় অহন ভি চলতাছে।' ঢাকাইয়ারা জন্মসূত্রেই ব্যবসায়ী। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য মাপার তার যোগ্যতা নেই। তিনি ব্যবসায় দ্বারা সব কিছু নিরূপণ করেন। এটি একজন আদিবাসী বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর কথা নয়। এ মনোভাব আমাদের অনেকের। জাতি হিসাবে আমাদের দেউলিয়াত্ব এখানেই। অথচ আমাদের প্রিয়জন সৈয়দ মুজতবা আলীর খুব প্রচলিত উক্তি- 'বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।' তিনি যুক্তি দেখান, বই কিনলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। জ্ঞানের চর্চা আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেবে। সেই জ্ঞান আপনাকে অর্থ-বিত্ত-চিত্ত সবটুকুই দিতে পারে। বিজ্ঞজনেরা আজকাল 'নলেজ ক্যাপিটাল' বা 'জ্ঞান পুঁজি'র কথা বলছেন। এ জন্যই ডব্লিউটিও-বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা জ্ঞান ও পণ্যের পেটেন্টের কথা বলছে। পৃথিবীর সব আবিষ্কারক তাদের সৃজনশীলতার জন্য প্যাটেন্ট অধিকার পাচ্ছেন। এ অধিকার তাদের সম্পদ-সম্মান উভয়ই দেবে। অন্য দিকে আমাদের গ্রন্থশিল্প যদি দেশ-বিদেশে বিকশিত হয় তাহলে আমরাও হবো লাভবান। ব্যক্তিসুবিধা লাভ করলে রাষ্ট্রসুবিধা লাভ করে। আজকাল বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বের সর্বত্র আমাদের বইমেলা, বই বিপণন সম্প্রসারিত হয়েছে। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক অথবা ব্যাংককে আমাদের প্রকাশনা পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর সপ্তম ভাষা হওয়ায় আমরা এ আন্তর্জাতিকতা পাচ্ছি। কলকাতায় আমাদের বইমেলা বসে। কিন্তু তাদের কোয়ালিটির কাছে আমরা হার মানছি। বইমেলায় হাজারো বই আসছে। আমরা মান নিশ্চিত করতে পারছি না। বইয়ের মান, বিষয়বস্তু ও শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকেও অসংখ্য ভুলের প্রমাণ আছে। সৈয়দ সাহেব মজা করে বলেন, 'বই সস্তা নয় বলে লোকে

বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।' উভয়ই সত্য, সে ক্ষেত্রে সরকারকে সাবসিডি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমি দেখেছি, ভারতের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় খুব কম মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। বাড়ির পাশে পশ্চিম বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য উন্নতমানের 'রাজ্য পুস্তক পর্ষদ' রয়েছে। আমাদের এনসিটিবি- শুধু স্কুলের বই ছাপে। অথচ তারা উচ্চশিক্ষার মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করে। বই বিপণনের আরেকটি উত্তম উপায় হচ্ছে পাঠাগার আন্দোলন। পৃথিবীর সর্বত্র- এমনকি পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠাগার দেখেছি। মার্কিন প্রেসিডেন্টও অবসর নেয়ার পর নিজ নিজ এলাকায় বড় বড় লাইব্রেরি বা পাঠাগার স্থাপন করেছেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের নেতা-নেত্রীদের নাম গন্ধও নেই। পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকে একটি আন্দোলন হিসেবে চালু করতে পারলে সহজেই গ্রামের সর্বত্র পাঠাগার পৌঁছে যেতে পারে। এখন যেমন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাগার বাধ্যতামূলক, তেমনি ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সরকার অনুদান দিয়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করতে হবে। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্ব নামে বা গ্রামের নামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বিষয়টিকে ব্যক্তি-গোষ্ঠীর কোন্দল, দলীয়করণ ও প্রাধান্যমুক্ত রাখতে হবে। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে বলেন, 'আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' জ্ঞানার্জনকে পৃথিবীর অগ্রসর জাতিগুলো শ্রেষ্ঠ কাজ বলে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জ্ঞান মানেই হচ্ছে শিক্ষা। আর বই হচ্ছে শিক্ষার বাহন। সুতরাং যতই বইয়ের লিখন, প্রকাশন ও বিপণন বৃদ্ধি পাবে ততই আলোর রাজ্যেরও বৃদ্ধি ঘটবে। যথার্থ আলোকিত হলে মনের প্রসার বাড়বে। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে যে স্বার্থপরতা, নৃশংসতা, সঙ্কীর্ণতা ও পাশবিকতার প্রকাশ ঘটছে তা আমাদের বিচলিত না করে পারে না। সততা, সাহসিকতা, স্বচ্ছতা ও জববাদিহিতাবিহীন যে সমাজ নাগরিকেরা প্রত্যক্ষ করছে তার প্রতিকার করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আমরা সবাই জানি 'উদারের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না কিন্তু আমরা সবাই মানি না যে

মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহ রক্ষা অবশ্য সবারই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারে ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে।' মনকে সজাগ ও সবল রাখার উপায় হচ্ছে গোটা জাতিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। জ্ঞানের আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও আলোকিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই অধঃপতিত হয়েছে যে, 'কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না'। একটি আলোকিত সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমাজ গড়ায় প্রতিটি নাগরিককে হতে হবে আগুয়ান। অবশেষে ভিক্টর হুগোর কথা দিয়ে শেষ করি- 'বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানবসমাজকে সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জ্ঞান দান করে, অতএব বই হচ্ছে সভ্যতার রক্ষাকবচ।'